ইউনিট ৪

পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্ব

পাঠ-১ : ভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট পর্যায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ভাষা আন্দোলন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত ১২টার সময় ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে পূর্ব বাংলা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাপূর্ব পর্যন্ত (২৫ মার্চ) পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল।

জন্ম থেকেই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে পাকিস্তান একটি নজিরবিহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১২শ মাইলের বেশি। মধ্যখানে বিশাল ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র থাকায় উভয় অঞ্চলের সঙ্গে স্থল পথে কোনো যোগাযোগ ছিল না। আকাশ ও জলপথে যোগাযোগ খুবই ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ ছিল। সুতরাং, শুরু থেকেই পাকিস্তান ছিল একটি অবিশ্বাস্য এবং নজিরবিহীন রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে এ ধরনের রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা কেমন হবে এ নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা হয়নি, আলোচনাও হয়নি। তখন দ্বিজাতি তত্ত্বে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনসাধারণ আবেগাপ্লুত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও বৈষম্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তে শুরু করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার বা সংখ্যা কী হবে তা কখনো আলোচিত হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে সরকারে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও আমলার অবস্থান একচেটিয়া হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বীকার করতে বা মর্যাদা দিতে চায়নি। তারা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি কলোনি হিসেবে শাসন ও শোষণ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষ ক্রমেই প্রতিবাদমুখর হতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে তখন জাতীয়তাবাদের চিন্তা, গণতন্ত্রের স্বপ্ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়গুলো অনেকটাই রাজনৈতিকভাবে পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টি করে। তা থেকেই ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে এবং ১৬ ডিসেম্বরে অবশেষে আমরা বিজয় অর্জন করি।

ভাষা আন্দোলন

ক. ভাষা আন্দোলনের সূচনা

পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্র ভাষা কী হবে তা নিয়ে একটি বিতর্ক পাকিস্ড়ান সৃষ্টির আগেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ বিতর্ক যখন শুরু হয় তখন পাকিস্ড়ানের ধারণাও তেমন স্পষ্ট ছিল না। ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু প্রবর্তনের সুপারিশ করলে ফজলুল হকের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়ে যায়। এরপরও ভাষা নিয়ে বিতর্ক উঠলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি তেমন জোরদার হতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক পুনরায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে তারিখ চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্ড়াব দিলে পূর্ব বাংলার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ কয়েকজন ভাষা বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লিখেন। তারা এটিকে একটি অবাস্তব উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন। কামরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত গণ-আজাদী লীগ 'মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান' এর দাবি জানায়। এরপর ১৪ আগস্ট সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করতে থাকে। এমতাবস্থায় ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ২ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় তমুদ্দুন মজলিশ। এ সংগঠন ১৫ সেপ্টেম্বর "পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এর আগে ৬-৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত যুবকর্মী সম্মেলনে "বাংলাকে শিক্ষা ও আইন আদালতের বাহন" করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অক্টোবর মাসে "তমুদ্দুন মজলিশ" ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন। তাতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ববাংলায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও সূচনা এভাবেই শুরু হয়।

খ. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব

করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের পর থেকেই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। কারণ এ সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের বাংলাভাষা বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমত গড়ে তুলতে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবী মহল এগিয়ে আসেন। ডিসেম্বর মাসেই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নতুনভাবে গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সচিবালয়ে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার ঐ সময় ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারিসহ ১৫ দিনের জন্য সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন আরো গতি লাভ করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সুনির্দিষ্ট দাবিনামা প্রণয়ন করে। পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি জানান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাসহ বেশ কিছু দাবি মেনে নেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ সব দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ ঢাকায় সফরে এসে প্রথমে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'উর্দু, কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উভয়ক্ষেত্রেই ছাত্র-দর্শকরা 'না না' বলে প্রতিবাদ করেন। সংগ্রাম পরিষদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তাতেও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৫০ সলে পাকিস্ড়ানের গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পুনরায় পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে উল্লেখ করেন। পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে। সর্বক্ষেত্রেই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে।

গ. ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জিন্নাহর অনুকরণে 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' ঘোষণা প্রদান করলে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আবার তীব্র হয়ে উঠে। উক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ৩০ জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। ৩১ জানুয়ারি আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি বিভিন্ন দাবি এবং কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলন অগ্রসর করে নেয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। তারা পরিষদের কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। ঐ দিনের সমাবেশ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি সরকার এক ঘোষণায় ঢাকায় ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ রাতে আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন সংগঠন বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ১০/১২ জনের একটি করে দল বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে অগ্রসর হলে প্রথমে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়, তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনি গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। এরপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুলিবিদ্ধ আবদুস সালাম ৭ এপ্রিল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতা নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি শোক র‍্যালি বের করে। এখানেও পুলিশের গুলি বর্ষণে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলি বর্ষণের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে পূর্ব বাংলার সর্বত্র তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঘ. প্রতিক্রিয়া

২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতার আহত ও নিহত হওয়ার সংবাদ সারা দেশের মানুষের কাছে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চট্টগ্রামের কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করেন বিখ্যাত "কাঁদতে আসিনি" কবিতাটি। ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শহীদ মিনার তৈরি করলে পুলিশ তা ২৬ তারিখে ভেঙ্গে ফেলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মেধাবী ছাত্র কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লেখেন 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি। আবদুল গাফফার চৌধুরী রচনা করেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', আবদুল লতিফ রচনা করেন 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', 'তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' প্রভৃতি গান। একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মুনীর চৌধুরী রচনা করেন 'কবর' নাটক। অনেকেই কবিতা, গান, ছোট গল্প, নাটক রচনা করে মানুষের দায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৬ সালের শাসকগোষ্ঠী অবশেষে বাংলা ভাষাকে পাকিস্ড়ানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাংলাভাষাকে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত থাকে পাকিস্ড়ানের পরবর্তী বছরগুলোতে। ১৯৬৯ সালে জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারিকে অবলম্বন করে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাস রচনা এবং চলচ্চিত্র তৈরি করেন।

ঙ. ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য পূর্ব বাংলায় সূচিত আন্দোলন পাকিস্ড়ান সরকারের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-বিরোধী অবস্থানকে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। ফলে অগ্রসর অংশ হিসেবে ছাত্র সমাজসহ শহুরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত মানুষ মাতৃভাষার গুরুত্বকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারায় আপামর জনসাধারণ দ্রুত ও আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক আন্দোলনে তা কার্যকর ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টে এর বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের চেতনা বিশেষভাবে প্রেরণা যোগায়। তবে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম বিস্ফোরণ ঘটে তার মূলে ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার চাকমা, মারমা, সাঁওতালসহ ছোট ছোট আদি জনগোষ্ঠীও অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলন ছোট বড় সকল জাতিসত্তার ভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯)

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক একটি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মূলত মুসলিমলীগে বাঙালি বিরোধী ভূমিকা, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ সমর্থন, সরকারে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকার প্রতিক্রিয়া হিসেবে একান্ত বাঙালি স্বার্থ-সংশ্লিষ্টের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান লাভ করেন কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব। আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২ দফার একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। দফাগুলোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব বাংলার নিজস্ব পদাতিক বাহিনী, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, নৌ ও বিমান বাহিনী রাখার বিধান, পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন, পাটশিল্প জাতীয়করণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। জন্মের শুরু থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ে আপসহীন ছিল। এসব কর্মসূচি পূর্ববাংলার মানুষের স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় দ্রুত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। যতবেশি আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা লাভ শুরু করে ততবেশি পাকিস্তান সরকারের দমন-নিপীড়ন দলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে শুরু হয়। মাওলানা ভাসানী, শামসুল এবং শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শেখ মুজিবকে দল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান সরকার একের পর এক মামলায় জড়িয়ে জেলে পুরে রাখে। ১৯৪৯ সালে তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক নাগাড়ে জেলে ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাধারণ মানুষের কাছে সুবিদিত ছিল। আওয়ামী লীগও যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পূর্ব বাংলার মানুষের রায় আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নতুন বাঁক সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়। পরবর্তী সময়ে ভাসানী, আতাউর রহমানসহ অনেক নেতৃবৃন্দই এই দল থেকে সরে গিয়ে অন্য দল গঠন করলেও আওয়ামী লীগের পরিণতি মুসলিম লীগের মতো হয়নি। বরং অন্যান্য দল দুর্বল হয়ে পড়লেও আওয়ামী লীগ বরাবরই সংহত হয়েছে। এর মূলে ছিল আওয়ামী লীগের গণভিত্তি, গণসম্পৃক্ততা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের কর্মসূচি, বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দাবি ও রাজনৈতিক কর্মসূচি। অপরদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল মূলত অবাঙালি, অভিজাত শ্রেণীর হাতে- যাদের গণভিত্তি ও গণসম্প্রক্ততা তেমন ছিল না। এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অসাধারণ

সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক নেতাকর্মী দলটিকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব অর্জন করে দলটি, এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মোতাবেক) পরিষদের নির্বাচনের পর পরবর্তী নির্বাচন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে এরই মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের ৩৪টি আসন শূন্য হয়ে পড়ায় সেগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। সরকার ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল আসনের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয় দেখে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখে। বাকি আসনসমূহের উপ-নির্বাচনও আর করতে দেয়নি। উক্ত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন নিয়ে সরকার সময় ক্ষেপণ করে চলতে থাকে। বিভিন্ন দলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ২১ দফা কর্মসূচি

পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে মুসলিম লীগ সরকার এবং পাকিস্ড়ানের শাসক মহলের বাংলা ভাষা ও বাঙালি বিরোধী মানসিকতা প্রকাশ পেতে থাকে। তা ছাড়া প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সরকারের নানা রকমের ষড়যন্ত্র ও টালবাহানায় জনগণের কাছে সরকারের চরিত্র আরও পরিষ্কার হতে থাকে। সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করে। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনে ঐ সময় বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। চারটি দল যথা আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি (ফজলুল হক), নেজাম-ই ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল (বামপন্থী দল) এর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ২১ দফা রচিত হয় এবং ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ২১ দফার অন্যতম দাবি ছিল ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, শিল্প-শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া, পাঠ শিল্প জাতীয়করণ করা, সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান করা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ পরিকল্পনা করা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনে সমতার ব্যবস্থা করা, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন পৃথকীকরণ, পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা ইত্যাদি। যদিও এতে অর্থনৈতিক কর্মসূচি তেমন বেশি ছিল না তথাপিও ২১ দফাকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষ 'মুক্তি সনদ' মনে করে গ্রহণ করেছিল। যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী মানুষের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন।

নির্বাচন বিধি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে কিছুটা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ৩০৯ আসনে স্থির করা হয়। এতে ২৩৭টি মুসলমান, অমুসলিমদের জন্য ৭২টি আসনের মধ্যে ৩১টি সাধারণ হিন্দু, ২৬টি তফসিলী (নিম্নবর্ণের) হিন্দু, ২টি বৌদ্ধ, ১টি খ্রিস্টান, ৯টি মহিলা (মুসলিম), ১টি মহিলা (হিন্দু) ও তফসিলী তিন সম্প্রদায়ের ২টি মহিলা সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ নেতা নুরুল আমিনও উক্ত নির্বাচনে পরাজিত হন। যুক্তফ্রন্ট এককভাবে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টির মধ্যে ২২৩টি আসন (আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৪৩টি) লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের সব কটিতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরাই জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের বৈধতা লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা (১৯৫৪)

নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট সর্বসম্মতভাবে শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে ফ্রন্টের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নেতা নির্বাচন করে। ফলে পূর্ববাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে ২৫ মার্চ (১৯৪৫) মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানালে তিনি ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উক্ত মন্ত্রিসভায় ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার বিভাগ, আসরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয় (তখন বিভাগ বলে পরিচিত ছিল) এর দায়িত্ব লাভ করেন। মে মাসের মাঝামাঝি ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের কয়েকজন

সদস্যকে অন্ড়র্ভুক্ত করেন। তখন অনেক বেশি বিলম্ব হয়ে যায়। মন্ত্রিসভা গঠনে ফজলুল হক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি ফ্রন্টের সকল দলকে সমানভাবে মর্যাদা দেননি, ফলে অচিরেই ফ্রন্টের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর সুযোগ গ্রহণ করে কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকার।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবদান

যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বল্পস্থায়ী হলেও এ সময়ে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছিল তা হচ্ছে, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিবস ঘোষণা, বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাব অনুমোদন দান, পূর্ববাংলার স্বয়ত্তশাসন আদায়ে সচেষ্ট হওয়া, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি উলে- খযোগ্য।

মন্ত্রিসভা বাতিল

প্রথম থেকেই পাকিস্ড়ানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক সরকারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন কিংবা উপলক্ষ খুঁজতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বির"দ্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোকে মন্ত্রিসভা বাতিলের কারণ বা উপলক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়।

১। **'কলকাতা ষড়যন্ত্র'** ঃ পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক কলকাতায় এক সফরে যান। তিনি বাংলা ভাষা ও দুই বাংলার বাঙালি, ভারতবর্ষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে খোলামেলা কিছু কথা বলেন। যেমন তিনি বলেন, "বাঙালি এক অখন্ড জাতি। তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে। বাঙালা অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথ প্রদর্শন করেছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে থেকে কাজ করতে পারে।" বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গে বঙ্গ ভাষার জন্য উৎসাহ বেশি। এমনকি, বঙ্গ ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করার জন্য পূর্ববঙ্গে একটি ক্ষুদ্র শিশুও প্রাণ দিতে পারে।" বলা বাহুল্য শেরে বাংলার এসব বক্তব্য বিকৃতভাবে পাকিস্ড়ানের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁর বক্তব্যকে শেরে বাংলার 'কলকাতা ষড়যন্ত্র' যা 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২। **রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ** ঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্মুখে মে মাসের ২ তারিখে জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় মহল- াবাসীদের মধ্যে এবং ১৫ মে তারিখে আদমজি পাটকলে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে আর একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। এসব সংঘর্ষকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতা হিসেবে আখ্যায়িত করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২৫(ক) ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার (গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ) ১৯৫৪ সালের ৩০ মে তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ড় করেন। মাত্র ৫৬ দিন যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলাকে গৃহবন্দি, মাওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর বাধানিষেধ আরোপ এবং শেখ মুজিবসহ প্রায় সাড়ে তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রতিক্রিয়া

একটি প্রাদেশিক সরকারকে এতো দ্রুত সময়ের মধ্যে বরখাস্ড় করায় পূর্ববাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ফজলুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বাইরের পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে পারেননি। সরকার ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। তবে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচনা এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এসব আন্দোলন দমন করতে পাকিস্ড়ানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্ড়ানের শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এরই ধারাবাহিকতা মাত্র।

পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের অরাজক শাসন ও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র

ফজলুল হকের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়। ঐ সময়ে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ববাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পূর্ব বাংলায় পাঠানো হয়। তবে ঐ সময় থেকে কেন্দ্রে ও পূর্ববাংলার ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক রদবদলে যে রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি হয় তা পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার চরম দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর এক ঘোষণায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ববাংলার গণপরিষদ বাতিল করে দেন। আবার ১৯৫৫ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে নতুন গণপরিষদ গঠন করেন।

এরপরও কেন্দ্র পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯৫৫ সালের ৬ জুন উক্ত ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করে আবুল হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আবুল হোসেন সরকারের প্রাদেশিক সরকার ২১ দফা বাস্ড়বায়নে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেন্দ্রে ১৯৫৫ সালের ১১ আগস্ট চৌধুরী মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে একটি সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা

করাই ছিল এই সরকারের প্রধান কৃতিত্ব। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি উক্ত সংবিধান গৃহীত হয় এবং ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। এই শাসনতন্ত্রে ২৩৪টি ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সংসদীয়, এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল থেকে প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে সংবিধানসম্মত শাসন পাকিস্তানের কেন্দ্র বা প্রদেশের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধান মোতাবেক ১৯৫৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা ছিল, কিন্তু তার আগেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক শাসন অবশ্যম্ভাবী করা হলো। সর্বত্র দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, রেষারেষি বৃদ্ধি পায়। মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ১৯৫৭ সালের ২৭ জুলাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন, ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে তুমুল হট্টগোল ও মারামারিতে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী আহত ও পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সে কারণেই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলা এবং পাকিস্তানে একটি অরাজক অবস্থার তৈরি করে। কেন্দ্র ও প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন নিয়ে অনেক মুখরোচক গল্প তৈরি হয়। সম্ভবত পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির প্রস্তুতি হিসেবেই ঘটনাসমূহ ঘটতে মহলবিশেষ সাহায্য করেছে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের (১৯৪৭-১৯৪৮) বিবরণ দিন।
২. তামদিন মজলিসের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. আওয়ামী মুসলিম লীগ কখন ও কেন গঠিত হয়েছিল?
৪. যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর মূল দাবিনামা বর্ণনা দিন।
৫. পাকিস্থানের প্রথম সামরিক শাসন কীভাবে আসে?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি আলোচনা করুন।

পাঠ-২: পাকিস্ড়ানে সামরিক শাসন এবং স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮-১৯৭১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পাকিস্ড়ান আমলে পূর্ব বাংলার জাতি বৈষম্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছয় দফা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদ বাতিল করেন, দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ সামরিক শাসন জারি করেন। নতুন সামরিক সরকার আবুল মনসুর আহমাদ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তবে ২৭ অক্টোবর সামরিক বাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারিত করে নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। একই সঙ্গে আইয়ুব খান সেনাপ্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসকের পদও গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই আইয়ুব খান দেশে দুর্নীতি, চোরাচালানি দমন ইত্যাদি নামে ব্যবসায়ীদের হয়রানি শুরু করেন। দেশে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তিনি সস্ড়া জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ডের ওপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করে তিনি একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর এক আদেশ বলে আইয়ুব খান উভয় পাকিস্ড়ান থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার সদস্য নির্বাচন, তাদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। এটিকে তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) নামে অভিহিত করেন। তিনি ১৯৬০ সালে এসব 'গণতন্ত্রীদের' আস্থা (হ্যাঁ, না) ভোটে তিনি পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। একইভাবে তিনি ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের 'মৌলিক গণতন্ত্রী' (বিডি) সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করেন। তবে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে (২ তারিখ) দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটি তার জন্য সহজ ছিল না। ঐ নির্বাচনে আইয়ুব বিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি পায়। যদিও ৮০ হাজার বিডি মেম্বারের ভোট পাওয়ার কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারপরও পূর্ব পাকিস্ড়ানের গভর্নর পদে ১৯৬০ সালের ৫ এপ্রিল জেনারেল আজম খানকে নিযুক্ত করেন। তিনি বেশিদিন উক্তপদে বহাল থাকতে পারেননি। তার স্থলে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত গোলাম ফারুখকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐ সময় মুসলিম লীগের অনুগত উকিল আবদুল মোনায়েম খানকে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্ড়ানের গভর্নর পদে নিয়োগ প্রদান করেন। মোনায়েম খান আইয়ুব খানের পতন পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন।

সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ১৯৬১ সালের শেষের দিকেই আন্দোলন শুরু হয়। তবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারির ৩০ তারিখ সোহরাওয়ার্দীকে করাচীতে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠে। শেখ মুজিবুর রহমানকেও তখন গ্রেফতার করা হয়। এ সব গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। তাদের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘট পালিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আইয়ুবের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে একটি কার্যকর আন্দোলন দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি, গ্রেফতারি পরওয়ানা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বন্দিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবিনামা নিয়ে ছাত্ররা ঐ সময় ১৫ দফা ঘোষণা করে। শুধু ছাত্ররাই নয় দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরাও ১৯৬২ সালের জুন মাসে আইয়ুব খানের প্রস্ড়াবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান ও দাবিনামার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছাত্রদের আন্দোলন দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬২ সালের আগস্ট মাস থেকে দেশব্যাপী সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। ঐ সময় ১৯৫৯ সালে গঠিত শরীফ কমিশন রিপোর্ট (শিক্ষানীতি বিষয়ক) প্রকাশিত হলে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এটিকেই ৬২-র শিক্ষানীতি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আহুত ধর্মঘটে ছাত্র সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন অংশ গ্রহণ করে। ঐ দিন ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনে কয়েকজন ছাত্র নিহত, আহত ও গ্রেফতার হন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

১৯৬২ সালে রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ গঠন করে দেশব্যাপী সভা-সমাবেশের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। এনডিএফ ১৯৫৬ সালের সংবিধান

পুনর্বহাল করারও দাবি জানায়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসনের চিত্র নানাভাবে তুলে ধরার সুযোগ গ্রহণ করে, তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারণা চালায়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ ১৭ দিন অব্যাহত ছিল। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে দীর্ঘ দিনের কাশ্মির সমস্যা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ১৯৬৫ সালের জুলাই আগস্ট থেকেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরিকল্পনা মোতাবেক ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মির অঞ্চলে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় সশস্ত্র গেরিলাদের হিংসাত্মক তৎপরতা চলতে থাকে। পাকিস্তান একে ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মিরি জনগণের বিদ্রোহ বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাশ্মিরের ভারতীয় অংশে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অচিরেই ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হলে পরিস্থিতি পাকিস্ড়নের জন্য মারাত্মক আকার ধারণ করে। পরে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্য শক্তির উদ্যোগে ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্বাঞ্চলের সীমান্তের প্রতি কোনো নজর দেয়নি। বিষয়টি পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক মহল, সাধারণসহ সকল স্তরের মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তাছাড়া বাঙালি সৈনিকদের রণক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রেরণ করা হতো। বিষয়টি বাঙালি সৈনিকদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও বৈষম্যমূলক বলে মনে হতো। আসলে যুদ্ধে বাঙালি সৈনিকদের ইচ্ছাকৃতভাবেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হতো। এরপরও যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে 'ভারত বিরোধী জিগির' তোলা হলো নগ্নভাবে। ইসলাম বিপন্ন হওয়ার ধোঁয়া তোলা হলো, রবীন্দ্র সঙ্গীত কেহিন্দু সংস্কৃতি, নজরুল ইসলামের গানকে 'হিন্দুয়ানি'র অভিযোগ এনে শব্দ বাদ দেওয়ার যুগপৎ চেষ্টা করা হলো। এসব কারণে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্ড়ন যুদ্ধের পরপরই পূর্ববাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি শুরু করে।

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি বৈষম্য

পাকিস্ড়ন সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা কতখানি রক্ষিত থাকবে সে সম্পর্কে ভাবতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্ড়ন রাষ্ট্র ক্ষমতার সকল ক্ষেত্র যেন ইংরেজদের হাত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে চলে যায়। প্রশাসন, সামরিক-পুলিশ বাহিনী, বিচার বিভাগসহ সর্বত্র পূর্ব বাংলা যেন পশ্চিম পাকিস্ড়নের শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব লোক ছাড়া কাউকে নিয়োগ দেওয়া হতো না। বাংলা ভাষা, বাঙালি, বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসক মহলের ভুল ধারণা, বিদ্বেষমূলক মনোভাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচন্ডভাবে কাজ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও বাঙালিরা শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতির চর্চা, রাজনৈতিক কর্মকান্তে পাকিস্ড়নের অপর যে কোনো জাতিগোষ্ঠী থেকে ঐতিহাসিকভাবেই অগ্রগামী ছিল। কিন্তু পাকিস্ড়নের শাসকগোষ্ঠী তা কখনো বুঝতে বা উপলব্ধি থেকে ঐতিহাসিকভবেই অগ্রগামী ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তা কখনো বুঝতে বা উপলব্ধি করতে চায়নি। তাছাড়া পাকিস্ড়ন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক চরিত্রদানে পাকিস্তানের শাসক মহলের কোনো আগ্রহ ছিল না। শাসকদের অধিকাংশই সামন্ত জমিদার শ্রেণী, বণিক গোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনী থেকে আগত ছিল। তাদের মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না। ফলে তারা পূর্ব বাংলাকে শুধু অবহেলাই করেনি, বরং অত্যন্ত হীন, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির 'হিন্দুয়ানি' নির্ভর মনে করতো। সেভাবে একে শাসন ও শোষণ করার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাতন্ত্র, সামরিক-আধাসামরিকসহ সর্বত্র আকাশ পাতাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের বেশিরভাগ অঞ্চল থেকেই অগ্রসর ছিল। মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান বছরের পর বছর ধরে অনেক গুণ বেশি বিবেচিত হওয়ায় পূর্ব বাংলা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে। যেমন ১৯৫৫/৫৬ সন থেকে ৫৯/৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছে মাত্র ১১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৫০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫) পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্ড়ন পায় ৯৫০ কোটি, পশ্চিম পাকিস্তান ১৩৫০ কোটি টাকা। ১৯৬৫ থেকে '৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট রাজস্ব ব্যয় ছিল ৬,৪৮০ মিলিয়ন টাকা, পশ্চিম পাকিস্ড়নের ক্ষেত্রে তা ছিল ২২,২৩০ সিলিয়ন টাকা। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, আয়-উন্নতির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষজন অনেক বেশি সুযোগ লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পূর্ববাংলা আগের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে।

এছাড়া নিম্নে সারণিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দের চিত্র দেখা যায়

খাত	পশ্চিম পাকিস্তান/টাকা	পূর্ব পাকিস্তান
১। শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন	৮০%	২০%
২। পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন	৫৮%	৪২%
৩। গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%
৪। শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক	৭৬%	২৪%
৫। প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
৬। মার্কিন সাহায্য	৬৬৫	৩৪%

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক (এলিট) গোষ্ঠীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রধান কারণ ছিল। তারা পূর্ববাংলার যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়োগ দান ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম বিমাতাসুলভ আচরণ করতো। ফলে প্রশাসনের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান বা দূরত্ব উভয় অঞ্চলের মধ্যে স্থল পথের মতোই বিশাল আকার ধারণ করে। নিম্নের ছকটিতে এক নজরে দুই অঞ্চলের বৈষম্যচিত্র দেখা যেতে পারে।

১৯৬৬ সালে চাকুরি ক্ষেত্রের অবস্থা

খাত	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্ড়ানি
১. প্রেসিডেন্টের সচিবালয়	১৯%	৮১%
২. দেশরক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
৩. শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%
৪. স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
৫. তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
৬. শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
৭. স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
৮. আইন	৩৫%	৬৫%
৯. কৃষি	২১%	৭৯%

বি. দ্র.ঃ শিক্ষকগণ উপরের চিত্রটি ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালি সৈনিকের নিয়োগ ও পদোন্নতির সুযোগ অত্যন্ড় সীমিত ছিল। বিশেষত অফিসার বা উচ্চতর পদে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অফিসারদের মাত্র ৫% লাভ করেছিল বাঙালিরা, সাধারণ সৈনিকদের ক্ষেত্রে তা ছিল মাত্র ৪% অর্থাৎ ৫ লক্ষ সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র ২০,০০০ জন ছিলেন বাঙালি। নৌবাহিনীতে উচ্চপদে মাত্র ১৯% এবং নিম্নপদে ৯% ছিল বাঙালি। বিমান বাহিনীতে বাঙালিদের অবস্থা আরো করুণ ছিল। অফিসার পাইলটদের ১১% এবং টেকনিশিয়ানদের মাত্র ১.৭% ছিল বাঙালি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি যতখানি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ততখানি ছিল না। যেমন ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৬৩টি, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল মাত্র ৮,৪১৩টি। অথচ ১৯৬৮/৬৯ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৮,৩০৮টি, পশ্চিম পাকিস্তানে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯,৪১৮টি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, প্রকৌশলসহ শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান যেভাবে দ্রুত বর্ধিত সুবিধা লাভ করেছিল পূর্ব পাকিস্ড়ান তা মোটেও পায়নি। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা প্রতি বছরই দ্বিগুণের চেয়ে বেশি ছিল। এভাবে পূর্ববাংলার অগ্রসর শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থ সংকটের কারণে স্থবির হয়ে পড়ে, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা দ্রুত সজীব হতে থাকে, উন্নতি লাভ করতে থাকে।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত-জমিদার, সামরিক ও বণিক গোষ্ঠী দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ আপন বিকাশে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। পাকিস্তান প্রশাসনে বাঙালি মধ্যবিত্তের উত্থানের পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় নুতন মধ্যবিত্তের উত্থান প্রায় বন্ধ হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে উচ্চতর পদে অপেক্ষাকৃত কমশিক্ষিত পাকিস্ড়নি গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে দেশের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ সর্বত্র। পাকিস্তান কার্যত পূর্ব পাকিস্তানকে গোলাম-এ পরিণত করার চাপে রাখে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সামন্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হয়ে উঠে সামন্ত-সামরিক-স্বৈরতান্ত্রিক। এর বিরুদ্ধে সে কারণেই পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর সুচিন্তিত রূপ লাভ করে ৬ দফার আন্দোলনে।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও নিপীড়ন

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রসর ও সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পাকিস্তান কালে সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান বেশি বরাদ্দ ও সুদৃষ্টি লাভ করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যতখানি পরিচালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে পূর্ব বাংলা তা পায়নি। এখানে নতুন পার্ক, স্টেডিয়াম, মঞ্চ, মিলনায়তন, স্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। অধিকন্তু পূর্ব বাংলায় বাঙালি ও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক চর্চাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। বাংলা ভাষা নিয়েই তো পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে তৈরি করা হয়েছিল দমন-নিপীড়নমূলক আচরণ। ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলার নামপরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়েছিল এবং বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পাকিস্ড়নিকরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। ১৯৬৭ সালে আইয়ুব সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং 'বাংলা নববর্ষ' উদযাপন নিষিদ্ধ করে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পাকিস্ড়নের রাষ্ট্রশক্তি কখনো সম্মান প্রদর্শন করেনি। কোন রাষ্ট্রের ৫৬ শতাংশ মানুষের ভাষা, সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা, দমন-নিপীড়ন এবং ধ্বংস করার নীতি নিয়ে সেই দেশ টিকে তাকতে পারে এমন নজির পৃথিবীতে নেই। পাকিস্ড়নও শেষ পর্যন্ত পারেনি।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসক মহলের সামগ্রিক বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ড় পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও উক্ত নির্বাচনে ফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছিল। ১৯৬২, ১৯৬৪ সালে শরিফ কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা প্রণয়ন করে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি, আইয়ুব খানের বিদায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন জ্ঞান পাকিস্ড়ান রাষ্ট্রের তীব্র বৈষম্য নীতিরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটেছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেমের জনগণের এতোসব প্রতিবাদের কোনো প্রতিকার না করে ১৯৭১ সালে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের অধিকার দমন করার চেষ্টা করলে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করার ঘোষণা সেই পাকিস্তানের বৈষম্য নীতি থেকে মুক্তির আকাঙ্খা হিসেবে পরিগণিত হয়।

	সোনার বাংলা শ্মশান কেন?	
বৈষম্য বিষয়	**বাংলাদেশ**	**পশ্চিম পাকিস্তান**
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি	শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৮৫ ভাগ
সামরিক বিভাগে চাকরি	শতকরা ১০ ভাগ	শতকরা ৯০ ভাগ
চাউল মণপ্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণপ্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সেরপ্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতিভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পি হাশেম খান।

এই পোস্টারটিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষমের চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল। পোস্টারটি গ্রাম-বাংলার সর্বত্র প্রচারিত হলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। পোস্টারের শিরোনামটি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। সে কারণেই এই পোস্টারটিকে একটি ঐতিহাসিক পোস্টার হিসেবে গণ্য করা হয়।

৬ দফা বাঙ্গালির মুক্তি সনদঃ

পাকিস্ড়নি শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন-সংগ্রাম ইতিপূর্বে শুরু হলেও উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করে সেই সব বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম ১৯৬৬ সালে উত্থাপন করেন। তিনি বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ নিয়ে যে ৬-দফা রচনা করেছিলেন তা অচিরেই পূর্ব বাংলার জনগণের 'মুক্তির সনদ' হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফা উত্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন দলের একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য তখন লাহোরে গিয়েছিলেন। তার উত্থাপিত ছয় দফার সংক্ষিপ্ত রূপটি নিম্নরূপ ঃ

১। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে- প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩। সারা দেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দু'ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা চালু করা যাবে।

৪। সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬। অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬-দফার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) প্রথম জনসভা করেন চট্টগ্রাম লাল দীঘির মাঠে। আইয়ুব খান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের দাবিনামা গ্রহণ বা আলোচনায় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক হয়রানিমূলক মামলা দিতে থাকে, তাকে বিভিন্ন জনসভা এবং নিজ বাসভবন থেকে বারবার গ্রেফতার করতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের সাহস বাঙালিকে অভিভূত করে। তিনি নির্ভীক অবস্থান থেকে ৬-দফার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলে আইয়ুব খান তাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা থেকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় এক নম্বর আসামী করেন। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে উক্ত মামলার ১ নম্বর আসামী করে ৩৫ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ভারতের আগরতলায় ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় পাকিস্তান ভাঙ্গার অভিযোগ এনে এই মামলা করা হয়। এই মামলার বিরুদ্ধে প্রথমে ছাত্র সমাজ, পরে আপামর জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে, অচিরেই সেই প্রতিবাদ গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

১১ দফার আন্দোলন

শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনকে আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের এবং তাদের বিচারের নামে সেনানিবাসে প্রহসনের নাটকের কথা জানাজানি হলে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিবাদ ও হরতাল পালিত হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্র সমাজ আন্দোলনকে বেগবান শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) মিলিতভাবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ উক্ত সংগ্রাম পরিষদের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের ইশতেহার হিসেবে ১১ দফা প্রণয়ন করে। উক্ত ১১ দফার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে যুক্ত করা হয়। ১১ দফায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তিদান, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল, ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিকস্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, বাক স্বাধীনতা, কৃষক-শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বৃহৎ শিক্ষা জাতীয়করণ, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি চালুকরণ, জরুরি নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) সমর্থন জানায়। ফলে ১৯৬৬ সালের শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ৬ দফা ১৯৬৯ সালে ছাত্রসমাজের ১১ দফার সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলনকে যে গতি প্রদান করে তা গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিতি পায়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি অত্যন্ড় তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ইতিপূর্বে আর কখনো তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পূর্ববাংলার প্রধানত বাঙালি জাতিগোষ্ঠী, এর পাশাপাশি এই ভূখন্ডে বসবাসরকারী ছোট-বড় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের বিশ্বাস থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে এতোখানি বিদ্রোহ করতে দেখা যায়নি যতখানি ১৯৬৯ সালে করেছিল। এটি একটি বিপ- বাত্মক ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। একটি অভূতপূর্ব গণজোয়ার আপন জাতিসত্তার চেতনায় ১৯৬৯ সালে জেগে উঠেছিল। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে বিদায় নিতে হলো। সামরিক শাসক ইয়াহিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়েও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা যায়নি। যে জাগরণ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানই হচ্ছে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণের মূল রাজনৈতিক প্রেরণা শক্তি এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সব চেয়ে সংগঠিত পূর্বপ্রস্তুতি।

ঊনসত্তরের প্রেক্ষাপট

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট হিসেবে ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্ড়ানের পূর্ববাংলা বিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিকসহ সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অনেক কারণ পুঞ্জিভূত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে এর তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে দুটো ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা, (২) ১৯৬৮ সালে দেশব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণভাবে 'উন্নয়নের এক দশক' উদযাপন করা। দুটো ঘটনাই পূর্ব বাংলার মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজ সোচ্চার হওয়ায় সাধারণ মানুষও জেগে উঠে। বাংলাদেশের রাজনীতির অগ্রণী নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ও বিচারের প্রহসনকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করে। তার ওপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের ধারা অব্যাহত রেখে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের (১৯৫৮-১৯৬৮) 'উন্নয়ন দশক' পালনের কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় ঘৃণা ও ক্ষোভের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে।

গণঅভ্যুত্থানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডাক) গঠিত হওয়ার পরই আন্দোলন ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ২০ জানুয়ারি উভয় জোটের আহ্বানে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হওয়ার সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে সারা দেশ যেন জ্বলে উঠে। ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি এই হত্যার প্রতিবাদে হরতালসহ ব্যাপক কর্মসূচি পালিত হয়। এই সময় থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো শহর বা গ্রামে আন্দোলনে কেউ না কেউ নিহত বা আহত হতে থাকেন। তবে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার বিচারাধীন অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হলে দেশব্যাপী আন্দোলন অগ্নিরূপ ধারণ করে। এর প্রমাণ পাওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিনা উস্কানিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা, কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষককে গুলি করে। এই ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলাকে এতটাই উত্তেজিত করে যে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের পক্ষে কিছু না বলে বসে থাকা আর সম্ভব ছিল না। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক ঘোষনায় উল্লেখ করেন যে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না। একই সঙ্গে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মিথ্যা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তির ঘোষণা দিতে তিনি বাধ্য হন। ২২ ফেব্রুয়ারি কারাগার থেকে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দি মুক্তি লাভ করলে ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)- এ শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এক গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা সভাটি স্মরণকালের সবচেয়ে বৃহৎ জনসভায় রূপান্তরিত হয়। উক্ত সভায় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে উক্ত বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করলে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতা তুমুল করতালির মাধ্যমে তা গ্রহণ করে নেয়। বঙ্গবন্ধু ঐ জনসভায় সবাইকে ৬ ও ১১ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের বিজয়ের একটি স্তর অতিক্রান্ত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর আইয়ুব খান ৬ ও ১১ দফা নিয়ে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে বসতে আহ্বান জানান। ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। দফায় দফায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচনসহ ভোটাধিকারের কিছু কিছু দাবি আইয়ুব খান মানলেও ৬ ও ১১ দফার আলোচনা তার অনীহার কারণে বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। তবে আইয়ুব খানের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি মোনায়েম খানকে গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে ড. এম এন হুদাকে উক্ত পদে বসান। তারপরও তার শেষ রক্ষা হয়নি। ২৫ মার্চ তিনি পদত্যাগ করে সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে সামরিক শাসনের মাধ্যমে স্তিমিত করার জন্যই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে আইয়ুব খান সরে গিয়ে সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি, শাসনতন্ত্র স্থগিত, জাতীয় পরিষদ স্থগিত এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের রেষ কিছুতেই না কাটায় ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সার্বজনীন ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা, এ উপলক্ষে ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সাল থেকে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ প্রত্যাহার করার ঘোষণা প্রদান করতে বাধ্য হন। এর ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে পরিবর্তনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ

যেহেতু কোনো গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাকিস্তানে কার্যকর ছিল না সে কারণে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ এর নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিধিমালা কার্যকর ছিল না। তাই পাকিস্তানের সংবিধান রচনার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া খান 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' বা আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, সাবেক প্রদেশগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, 'এক ব্যক্তির এক ভোট' নীতিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন, নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা নতুবা নতুন নির্বাচন, জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন মহিলাসহ ৩১৩ জন, পাঁচ প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ৬২১ জন ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফার পক্ষে জনসমর্থন আদায় করে। তবে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ভোটের আগে, ভাত চাই, স্লোগান জানিয়ে নির্বাচন বয়কট করে। অন্যান্য দলগুলো যার যার দলীয় অবস্থান থেকে জনগণের কাছে ভোট প্রত্যাশা করে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০-এর ফলাফল

দলের নাম	আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন (মহিলাসহ)	
	৩১৩	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১. আওয়ামী লীগ		১৬০+৭=১৬৭	০
২. পিপলস পার্টি		০০	৮০+৫=৮৮
৩. মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)		০০	০৯
৪. ন্যাপ (ওয়ালী)		০০	৬+১=৭
৫. জামায়াত ইসলাম		০০	০৪
৬. মুসিলম লীগ (কাউন্সিল)		০০	০৭
৭. জমিয়ত উল-উলেমা-ই ইসলাম (হাজারভী)		০০	০৭
৮. মারকাজী জমিয়ত-উল উলেমা ইসলাম		০০	০৭
৯. মুসলিম লীগ (কনভেনশন)		০০	০২
১০. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি		০১	০০
১১. স্বতন্ত্র		০১	১৬

নির্বাচনের ফলাফল

এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই ১৬৭টি আসন লাভ করেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্ড়ানে পিপলস পার্টি মাত্র ৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই ২৯৮টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থনের রায়ই প্রদান করে যা পাকিস্তানের শাসক মহলের অনুমানের বাইরে ছিল। সে কারণেই তারা শুরু থেকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায়কে বানচাল করার জন্য নতুন করে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্ড়ানের ২৩ বছরের ইতিহাসে ১৯৭০ সালেই সর্বপ্রথম উভয় অংশের জনগণ এক সঙ্গে রায় প্রদানের সুযোগ লাভ করে। পাকিস্ড়ানের শাসকগোষ্ঠী জনগণের রায় প্রদানের সুযোগ বন্ধ করে রাখার ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যে যে মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তা কোনভাবেই বোঝা ইতিপূর্বে সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পর যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েই মানুষ ভোট প্রদান করে। সেই রায়ের ফলাফলই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন লাভ। প্রধান এ দুটো দল দুই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পূর্ববাংলায় পাকিস্তানভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দলই তেমন আসন লাভ করতে পারেনি। এই নির্বাচন পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই নির্বাচন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ফাটল সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তা বুঝতে অক্ষম ছিল। অধিকন্তু তারা জনগণের রায়কে দমন করার জন্য ষড়যন্ত্র আঁটে এবং সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। অবশেষে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশ স্বাধীন করতে হয়।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও ভূট্টোর নীলনক্সা

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর সকলেই প্রতীক্ষা করছিল কবে, কখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ পশ্চিম পাকিস্ড়ানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কীভাবে সংবিধান রচনার কাজ সম্পন্ন করবেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দু'দফা বৈঠক করেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমান বন্দরে তিনি "শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সঙ্গেও অনুরূপ আলোচনায় বসেন। তবে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব করায় বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ শুরু হতে থাকে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডাকা নিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্ম নিতে শুরু করে। অবশেষে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার ঘোষণা দেওয়া হলে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান নের নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় না আসার পরামর্শ দেন। এতে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি বাংলদেশের জনগণের আস্থা আরো নষ্ট হতে থাকে। সেই সময় ভারতের একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে এনে ধ্বংস করা হয়। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। এর প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। মানুষের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি আস্থা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানের ইতিহাসে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের অধিকার বাঙালিরা লাভ করায় এ সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। পূর্ব বাংলায় অবস্থা আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ ঢাকায় নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান করলে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ছাড়া অন্য কোনো সম্মেলনে যোগদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ৩ মার্চ পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত টানা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ততদিনে পূর্ব বাংলার অবস্থা খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রস্তুতি নিতে থকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৪.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?
২. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখুন।
৩. ৬ দফা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট-আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. পাকিস্ড়ন আসলে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যের ওপর আলোকপাত করুন।
২. ৬ দফা কী? কেন এটিকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়।

৩. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩: মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠনের পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে। ঢাকা শহর পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। উক্ত জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ঘটনাবলি, জাতীয় পরিষদ নির্বাচন, তা স্থগিত রাখার ঘটনা, ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের কথা, ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ মানুষকে হত্যার বিবরণসহ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা করা হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন, পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ, নিরস্ত্র মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। অত্যন্ত জটিল সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। মুক্তির সেই সংগ্রাম যথার্থই কঠিন এবং এতে পাকিস্তানি পক্ষ তাকে হত্যা বা অন্যকিছু করতে পারে সে ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" বস্তুত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের 'সবুজ সংকেত' (গ্রিন সিগন্যাল) বলেই অভিহিত হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে তিনি আলোচনার যে চারটি শর্ত দিয়েছিলেন তা সেই পরিস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে তিনি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও পূর্ব ঘোষণা দিয়ে রাখেন- যা পরিস্থিতি অনুযায়ী (২৫ মার্চ-উত্তরকালে) জনগণ বুঝে নিতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল।

৭ মার্চ পরবর্তী ঘটনাবলি ও পাকিস্তান সরকারের পদক্ষেপ

অসহযোগ আন্দোলনের সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, ওয়ালীখানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আসেন। তবে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্যার সমাধান নয়, বরং বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পথের সন্ধান করা। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হয়তো সংকটের সমাধান কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাদের হাতে সমাধানের কোনো কিছুই ছিল না। তখন ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারা ১৬ মার্চ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করেন। অবশেষে বাংলাদেশের জনগণের ওপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতৃত্বকে গ্রেফতার, হত্যা এবং প্রতিবাদী বাঙালিদের হত্যা-নির্যাতনের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।

২৫ মার্চের রাতে সামরিক বাহিনীর বর্বর হামলা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ

ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের পর পরই পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক, কামান, অস্ত্র গোলা বারুদসহ ঢাকা শহরের যে সব স্থান থেকে প্রতিরোধ আসতে পারে সেগুলোতে হানা দেয়। তারা রাজার বাগের পুলিশ ক্যাম্প, পিল খানার পুলিশ ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে প্রথমে বর্বরোচিত হামলা চালায়, টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এসব স্থানে বাঙালি পুলিশ সদস্য, ছাত্র-শিক্ষকদের নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। ঢাকা শহরে গভীর রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম হত্যা যজ্ঞ শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে মানুষের বসতি, দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডে অবস্থিত নিজ বাসভবন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার আগে রাত ১১ টার সময় তিনি তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করার নির্দেশ দেন। গ্রেফতার হওয়ার আগে চট্টগ্রামের ইপিআর হেড অফিসে স্বাধীনতা ঘোষণার একটি বার্তা তিনি প্রেরণ করতে সক্ষম হন।

ঢাকায় পাক বাহিনীর হামলার প্রতিরোধে বাঙালি পুলিশ বাহিনী এগিয়ে আসে। দেশের অন্যান্য জায়গাতেও বাঙালি সামরিক বাহিনীর সদস্য, পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।

বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত বার্তা চট্টগ্রামে সাইক্লো কপি করে ২৬ মার্চ সকাল থেকে বিতরণ করা হয়, চট্টগ্রাম থেকে দেশের অন্যান্য স্থানেও বঙ্গবন্ধুর তারবার্তাটি প্রেরণ করা হয়। ২৬ মার্চ সারা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে, কার্ফ দিয়ে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখে। তবে যেখানে সুযোগ ছিল সেখানে মানুষ প্রতিরোধ করতে থাকে। অবশ্য ২৬ মার্চ বিবিসি, আকাশ বাণী, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, গণহত্যার খবর এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচারিত হয়। কিন্তু সেই সময় সঠিক তথ্য জানার সুযোগ কম থাকায় নানা গুজব ও বিভ্রান্তিও ছিল। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দুপুরে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত বার্তার সূত্র ধরে স্বাধীনতা ঘোষণার খবর নিজ কণ্ঠে প্রচার করেন এবং জনগণকে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের শিল্পী-শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালুর ঘাট রেডিও সাবস্টেশন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার নানা খবর পরিবেশন করেন, এম এ হান্নান পুনরায় উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে একইভাবে দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি নিজ কণ্ঠে ঘোষণা করেন। পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় অস্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা পাঠ করেন। অবশ্য ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করে তাকে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ঘোষণা দেন।

২৬ মার্চ-পরবর্তী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশে বসে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা না দেখে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে চলে যেতে থাকেন এবং ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নবগঠিত অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করে।

বাংলাদেশের সরকার গঠন

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসে বাংলাদেশের একটি সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হয়। নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দেন এবং মুক্তিযুদ্ধে জনগণকে অংশ গ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলা (মুজিবনগর) গ্রামে উক্ত সরকার শপথ গ্রহণ করে। এটাই বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি, চিফ অব স্টাফ কর্ণেল (অব) আবদুর রব, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং বিমানবাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদ এ. কে. খন্দকার গ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যপক ইউসুফ আলী নবগঠিত সরকারের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। ১০ এপ্রিল রাত্রিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, স্বাধীনতার জন্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পায়। মানুষ দেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতে পাড়ি জমিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এভাবেই প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ অবস্থা থেকে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি শেষে চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

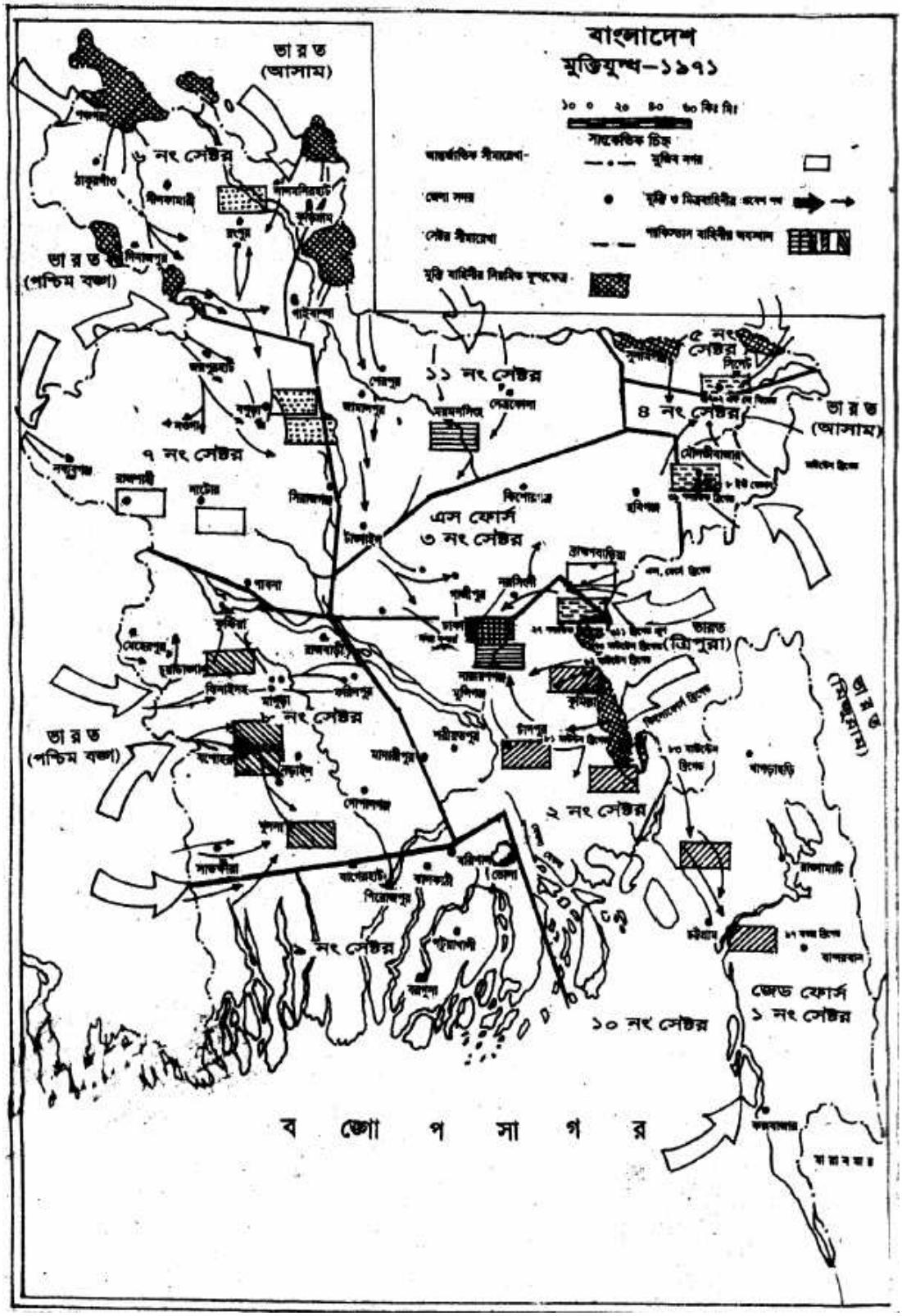

চিত্র ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

১০ এপ্রিল সরকার গঠিত হওয়ার পর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভারতে পাড়ি জমায় তাদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১০ এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে চারজন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ এপ্রিল তা পুনঃনির্ধারণ করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এগুলো ছাড়া বেশ কিছু সাবসেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। তবে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় সেক্টরে ৩০ হাজারের অধিক গেরিলা ছিলেন। প্রতিটি সেক্টরেই এভাবে নিয়মিত সেনা, গেরিলা, সাধারণ যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এরা মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিলেন। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক দলের কর্মী, কৃষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে এই যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্ড়ান বাহিনীর ছাউনি, আস্তানায় হামলা করতো, অনেকে সম্মুখ যুদ্ধেও বীরত্বপূর্ণ লড়াই পরিচালনা করতো। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও কয়েকটি বাহিনী দেশের বাইরে ও ভিতরে গড়ে উঠেছিল। যেমন মুজিববাহিনী, টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনী উল্লেখযোগ্য ছিল। বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) নামক একটি বাহিনী ছাত্র লীগের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে গড়ে উঠেছিল। আবার ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণেও মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দশম সেক্টরটি ছিল মূলত নৌ কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত। এরা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, মংলাসহ বিভিন্ন নৌ বন্দরে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করতে যুদ্ধ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মানুষই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কোনো নিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষণ তাদের ছিলনা। গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়া ও যুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান করেছে। সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করা হয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই মানুষগুলো রণক্ষেত্রে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন, অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। তারা যুদ্ধ করেছেন এবং শক্তিশালী পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন স্বাধীনতাকামী মানুষ।

বিভিন্ন দল ও পেশার ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই যুদ্ধের পটভূমিতে কাজ করেছিল। রাজনৈতিক দলের বাইরে শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আমলা, শিল্পী, সাংবাদিক, লেখক-বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে যারা ভারতে ও দেশের বাইরে ছিলেন তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায় করেন। বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পেশাজীবীরাও বিভিন্নভাবে গোপনে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষে পৃথিবীর অনেক দেশের সরকার অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে সব দেশের জনগণই পাকিস্ড়ানি বাহিনীর গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও নীতির তীব্র বিরোধিতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে উদারভাবে সাহায্য করেছিল প্রতিবেশী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি দেশ। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা এবং এক কোটির বেশি শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদের থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ও তাদের জনগণ বহন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কিছু কিছু দেশ অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ বেশ কিছু দেশের সরকার অবস্থান গ্রহণ করলেও সেই সব দেশের জনগণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সৃষ্ট ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি ১৪ ডিসেম্বর বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে বলে ঐ দিনটিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বলা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় যৌথ কমান্ডের ভারতীয় প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন, তিন লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারান, অসংখ্য মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১২ হাজারের অধিক ভারতীয় জোয়ান শহীদ হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বুকে পতপত করে উড়ে লাল সবুজের রক্তমাখা বিজয়ের পতাকা।

পাক হানাদার বাহিনীর আচরণ

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নিধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা শহর, বন্দর, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ মানুষদের হত্যা, নির্যাতন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে মানুষ ভয় পেয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে এক সময় যুদ্ধ আপনা আপনিই শেষ হয়ে যাবে। পাকিস্ড়ানি বাহিনী প্রতিটি শহরে নির্যাতন ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। ক্যাম্পে অমানুষিক নির্যাতন করে অনেককে মেরে ফেলা হয়েছে, অনেককে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া

হয়েছে। বাংলাদেশে অসংখ্য সাধারণ নিরাপরাধী মানুষকে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করেছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি নির্বিচারে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করেছে। তাদের ধর্মবিশ্বাসকে তারা অত্যন্ত হেয় চোখে দেখেছে। পাকিস্তানি বাহিনী দেশের নারীদের প্রতি অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করেছে। দেশের ৩ লক্ষ নারী, মা বোন তাদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। পাকিস্তান সরকারের বাঙালি বিরোধী আচরণকেই পাকিস্ড়নের সেনাবাহিনী ধারণ করেছে, ১৯৭১ সালে তাদের আচরণে সেই বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাবেরই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সাড়ে সাত কোটি মানুষই বলতে গেলে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছিল। দেশের কলকারখানা, অফিস-আদালতসহ সব কিছুই প্রায় বন্ধ ছিল। একদিকে পাকিস্ড়ন বাহিনী অনেক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে, অন্য দিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধারাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। দেশের রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, মংলা বন্দর, নৌ বন্দরসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধের নয় মাস বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এক কোটি মানুষের বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে, সম্পদহানি ঘটেছে। ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন অর্থকরী প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর যখন দেশটি বিজয় লাভ করেছে তখন গোটা বাংলাদেশ যেন একটি পোড়াবাড়িতে পরিণত হয়েছে, যেখানে ঘরে ঘরে কান্না আর হাহাকারের রোল পড়ে গিয়েছিল। এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ নিয়ে বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করেছে।

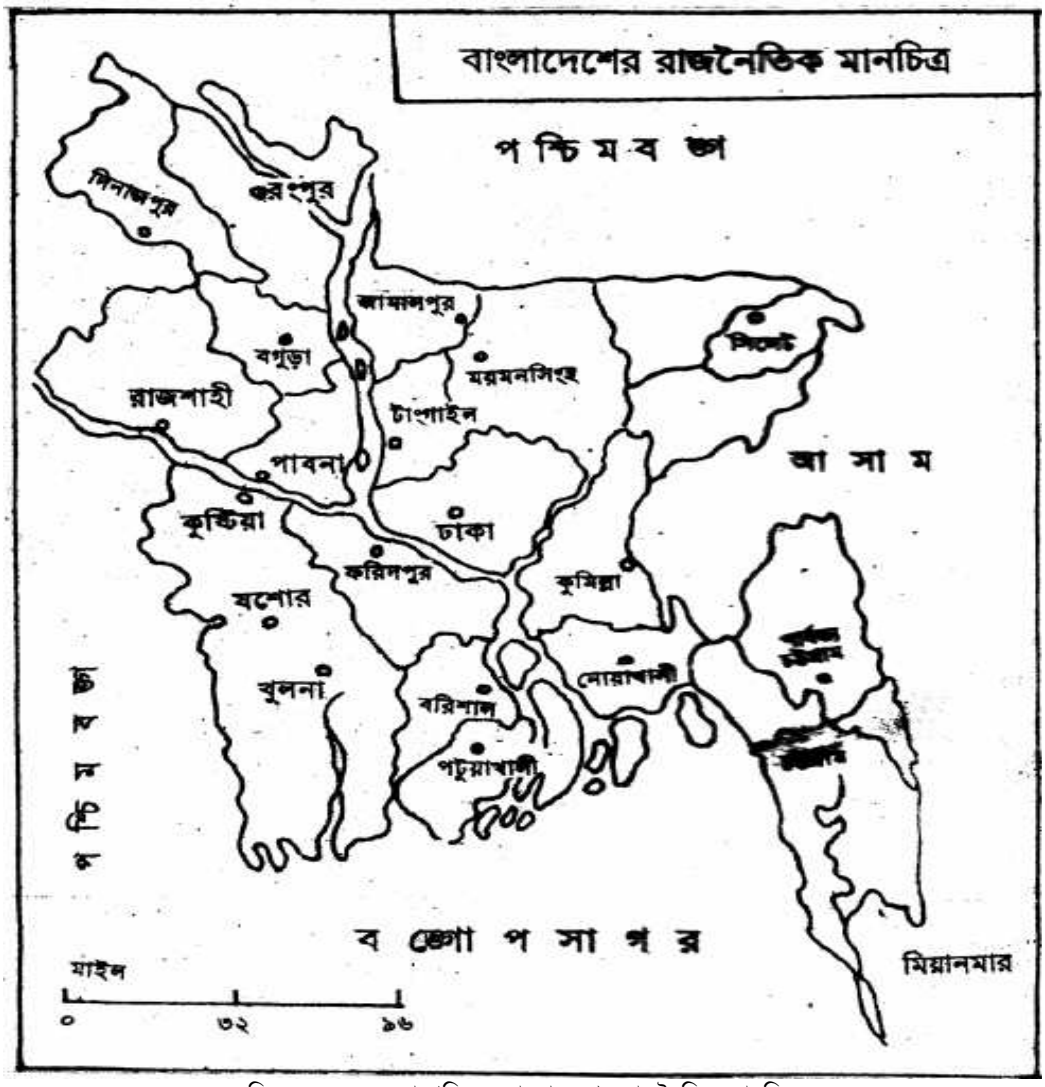

চিত্র ঃ বৃহত্তর জেলা পরিচয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে হাজার বছরের বাঙালির এবং এই ভূখন্ডে বসবাসকারী অন্যান্য ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর একটি স্থায়ী স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। এ ভূখন্তে একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষগণ। তাদের প্রতিনিধিদের অনেকেই সংগ্রাম করেছেন, আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের সংঘবদ্ধ আত্মত্যাগ অতীতের সকল আকাঙ্খার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের আপামর মানুষ তাদের শৌর্য-বীর্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রেখেছেন। এ থেকে ধারণা করা যায়, আমাদের দেশের মানুষ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হলে অনেক মহৎ অর্জন করা সম্ভব হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ ঘটেছিল সর্বতোভাবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে এ ভূখন্ডে বসবাসকারী বাঙালি, বিভিন্ন ছোট-বড় উপজাতি নিজ নিজ জাতিসত্তার বিকাশ সাধন, ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবন ধারার উন্নয়ন ঘটানোর এক অপূর্ব সুযোগ ঘটেছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ এক সঙ্গে কাঁধেকাঁধ রেখে যুদ্ধ করেছে, এক মোহনায় সকলের রক্ত গিয়ে মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সেই মিলন যে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল তা-ই পাকিস্তানের দক্ষ সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল। দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎ পদতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা, সাংস্কৃতিক সমস্যা দূর করে একটি আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে মুক্তিযুদ্ধের মতো জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন সব সময়ই আমাদের জন্য রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশকে পরিচালিত করলে এখানে আর কোনো অবিশ্বাস, ক্ষোভ, ভয়ভীতি, যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি হবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উদার গণতন্ত্রের সেই শিক্ষাই আমাদের জন্য রেখে গেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় এখন আমরা পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিকের পরিচয় দিতে পারছি। জাতিসংঘসহ পৃথিবীর সকল বৈধ সংস্থার সদস্য হওয়ার আমাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের পতাকা এখন পৃথিবীর দেশে দেশে উড়ছে। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারছে, চাকরিসহ নানা সুবিধা ভোগ করতে পারছে। দেশের অভ্যন্তরেও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের কারণেই আমরা এখন উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি, অনেকেই অনেক উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হতে পারছেন। দেশ স্বাধীন না হলে পরাধীনতার গ্লানি বহন করে আমাদেরকে আরো অনেকদিন চলতে হতো। আমরা তাই সকলে ঋণী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, যারা ঐ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, আত্মত্যাগ করেছেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অনন্ত পথ চলার প্রেরণার সবচেয়ে সাহসী অধ্যায়। জাতীয় জীবনে তাই এই মহান মুক্তিযুদ্ধের শিক্ষা চিরকাল সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল?
২. মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. মুক্তিযুদ্ধে বহি:বিশ্বের ভুমিকা কী ছিল?
৪. মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির একটি চিত্র তুলে ধরুন।
৫. মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ৭ মার্চের ভাষণ এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন এবং এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. ১৯৭১ সালে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল।
৪. মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।